দুই

বাংলাদেশে কমপিউটারায়ন

বিশ্বের সফটওয়্যার ও কমপিউটার সেবার বাজার বিশাল এবং দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এই বিরাট সুযোগকে বাংলাদেশের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক উপাদান যথা-- শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান জনশক্তি বাংলাদেশে আছে। এদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বেশি সময় বা অর্থেরও প্রয়োজন হবে না। প্রযুক্তিগত দিক থেকেও বর্তমানের তথ্য বিপ্লবে যোগ দিতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই।

জনাব এস, এম, কামাল

সভাপতি

বাংলাদেশ কমপিউটার পরিবেশক সমিতি

বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র উন্নয়ণশীল ও যে দেশের জনগণের সাধ অনেক সাধ্য কম – সে দেশে নতুন প্রযুক্তি আসবে, জয় করবে, উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করবে এতো সকলের চাওয়া, সকলের আশা-আকাংখা। এই পরম চাওয়া-পাওয়ার বস্তুকে হাতের মুঠোয় এনে সকলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত ও সাধকে সাধ্যের আয়ত্বে আনছে কমপিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, ঢাকায় ১৯৬৪ সালে এটমিক এনার্জি সেন্টারে প্রথম কমপিউটার স্থাপন করা হলো। এটি ছিল আই বি এম ১৬২০ সিস্টেম। এভাবে পদযাত্রা হলো শুরু। সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার পথে পথসঙ্গী হলো নানা প্রতিষ্ঠান। যেমন অগ্রণী ব্যাংক (আই বি এম ১৪০১) জনতা ব্যাংক (আই, সি, এল ১৯০১) ও আদমজী জুট মিল (আই বি এম ১৪০১)। স্বাধীনতার পরে পরিসংখ্যান বুরোর আই বি এম ৩৬০ কমপিউটারটি স্থাপিত হয়। তারপর বেশ কিছুকাল কমপিউটার আসার জোয়ার স্তিমিত থাকে। তবে এই অবসরে আনয়নকৃত কমপিউটারগুলো কাজ করে যায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আই বি এম ৩৭০ কমপিউটারটির আগমন হয়। যাত্রাপথে আগমনের সূত্র ধরে আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে মিনি ও মেইনফ্রেম কমপিউটার এসেছে। মাইক্রো কমপিউটার চালু হওয়ার পর বাংলাদেশে বেক্সিমকো কমপিউটারস ও সাইপ্রোকো কমপিউটারস এ ব্যবসায়ে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে অনুকূল আবহে এগিয়ে যাওয়ার পথে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। কালের স্রোতরেখায় সেই '৬৪ থেকে বর্তমান '৯১ সাল পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বে অন্যান্য দেশের ব্যবহারিক জীবনে কমপিউটারের প্রভাব যতটা বিস্তৃত, আমাদের দেশে সে তুলনায় ব্যবহারিক ক্ষেত্র খুবই সীমিত।

বর্তমানে বাংলাদেশের ছোট্ট বাজারে ৬০টি মত প্রতিষ্ঠান কমপিউটার ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছে। অল্প সংখ্যক মিনি ও মেইনফ্রেম ছাড়া বছরে এখন মাত্র ২০০০ থেকে ২৫০৪ মাইক্রো কমপিউটার বা পিসি বিক্রি হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে আমার এখন সেই চিরায়ত সত্যটিকেই মনে পড়ছে—"বিন্দু বিন্দু জল থেকেই সিন্ধু হয়"।

তবে, শুধু কমিপিউটার নামক যন্ত্রটি এনে আধুনিতার ছোঁয়া পাওয়া যাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গণশিক্ষার মত কমপিউটার শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। অন্যান্য প্রযুক্তির জ্ঞানের তুলনায় কমপিউটার ব্যবহারকারীকে প্রযুক্তি ব্যবহারে অধিক সচেতন হতে হয়। এটা প্রধানতঃ মস্তিস্কের কাজের সহায়তাকারী যন্ত্র। তাই ব্যবহারকারীর সমস্যাটিকে যত্নসহকারে বিশ্লেষণ করে তার জন্য সঠিক প্রোগ্রাম ঠিক করতে হয়। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় প্রচুর প্রযুক্তিগত জ্ঞান না থাকলে কমপিউটার ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায় না। আমাদের স্কুলের বিভিন্ন ক্লাশে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে অনেক সুপারিশ করা হয়েছে এবং বর্তমানেও এ ব্যাপারে অনেকেই সরব। যদিও এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের আরো অনেক চড়াই-উৎরাই পেরোতে হবে। বুয়েট ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ শিক্ষা দেয়া শুরু হয়েছে। যদিও এতে মুষ্টিমেয় লোকই শিক্ষিত হচ্ছে—বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির আরো ব্যাপক বিস্তৃত অবদান প্রয়োজন। শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রেই কমপিউটার চালনা করতে হবে তা নয়। কম বিদ্যা নিয়েও কমপিউটারে কি করে প্রশিক্ষিত হওয়া যায় সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে সর্বাগ্রে।

আমি মনে করি, যেহেতু বাংলাদেশে সীমিত সম্পদ, তাই পলিটেকনিকগুলোতে গ্রাজুয়েটদের জন্য যদি এক বছরের বিশেষ কমপিউটার ব্যবহারের ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা যায় তাহলে আমরা অল্প খরচে ও সময়ে দ্রুত সুফল পেতে পারি। তবে আর্থিক সংস্থানের উপরই পুরো পরিকল্পনাটির সাফল্য নির্ভর করবে। সর্বত্র কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে সরকারী মাধ্যম টেলিভিশনে সহজবোধ্য করে অনুষ্ঠান প্রচার করে আমাদের শিক্ষা দিতে পারে। কমপিউটার সম্বন্ধে ভুল ধারনা দূর করতে সবচেয়ে কার্যকরী প্রভাব রাখতে পারে সুলভ ও মাতৃভাষায় বহুল প্রচারিত পত্রিকাসমূহ।

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত "কমপিউটার জগৎ" পত্রিকার মতো বোধগম্য ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাই একমাত্র পারে তৃণমূল পর্যায়ে কমপিউটার স্বাক্ষরতার ব্যাপক সফলতা আনতে। শিক্ষার পাশাপাশি কমপিউটারের ব্যবহারিক দিকে আমাদের সমধিক দৃষ্টি দিতে হবে। বাংলাদেশের এই প্রযুক্তি প্রসারের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে আছে কর্মকর্তা ও ব্যবহারকারীদের জ্ঞানের অভাব। অনেকে কমপিউটার কেনার আগে চিন্তা করেন না যে কি কাজে, কাকে দিয়ে, কেমন করে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হবে। এ ছাড়া কোন মডেলের, কোন সিরিজের যন্ত্রটি কেনা হবে তাও বিবেচ্য বিষয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রয় পদ্ধতিও কমপিউটার ও সাধারণ ব্যবহৃত বস্তু যেমন টেবিল ক্রয়ের মধ্যে অনেক সময়ই তারতম্য করে না। সবচেয়ে কম দামে কেনাটাই নীতি। অন্য আর দশটা জিনিষের ক্ষেত্রে কেনার পর ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও কমপিউটারের ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার ঘটে। এখানে যন্ত্রটি কেনার পরেই ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক হয় শুরু। কারণ প্রশিক্ষণ, বিক্রয়োত্তর সেবা (ব্যবহারের ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে) ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়; বিশেষতঃ বাংলাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অভাবের কারণে। আমার মতে, কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে কাজটা করা হবে তার সুফল কি, সেটা পূর্বেই নির্ধারণ করে সেই ফল অর্জনের জন্য সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক নিয়োগ করা হয় না এবং হলেও প্রশিক্ষণের পর অন্যত্র চলে যায়। এ সব অসুবিধা দূর করার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া দরকার যেমন— কমপিউটার পেশাজীবিদের উপযুক্তভাবে সম্মানী দিতে হবে, অবশ্যই আকর্ষণীয় হারে। বর্তমানে যে হারে বেতন দেয়া হয় একে আরো উন্নতর করতে হবে ব্যবহারিক প্রয়োগ বাড়ানোর জন্যই।

বিশ্বের সফটওয়্যার ও কমপিউটার সেবার বাজার বিশাল এবং দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এই বিরাট সুযোগকে বাংলাদেশের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক উপাদান যথা — শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান জনশক্তি বাংলাদেশে আছে। এদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বেশি সময় বা অর্থেরও প্রয়োজন হবে না। প্রযুক্তিগত দিক থেকেও বর্তমানের তথ্য বিপ্লবে যোগ দিতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। আমার মতে এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারী পর্যায়ে দুধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব।

(১) সরকারী একটি কোম্পানীকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত করে একটি উদ্যোগ নেয়া

যেতে পারে। কারণ, বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ বাজার অনেক ছোট হওয়ার ফলে কমপিউটার কোম্পানীগুলো ক্ষুদ্র চাহিদা পূরণ করে থাকে। এদের পক্ষে বড় ধরণের বিনিয়োগের ঝুঁকি নেয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী সফলতা অর্জন করলে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো sub-contract ভিত্তিতে কাজ শুরু করতে পারে এবং পরে বিদেশের বাজারে একাকী প্রবেশ করতে পারে।

(২) বাংলাদেশে সফটওয়্যার হাউজকে বিশেষ সুবিধা প্রদান। যথা—

ক) অতি অল্প সুদে কমপিউটার যন্ত্র, সফটওয়্যার ইত্যাদি ক্রয় ও প্রশিক্ষণকালীন বেতন ইত্যাদি খরচের জন্য প্রকল্প ঋণ প্রদান। এ ধরনের উদ্যোগ শিল্প ব্যাংক নিয়েছিল কিন্তু মাত্র দুটি প্রকল্পকে এ ধরনের সুবিধা দেয়া হয়েছে।

খ) এ প্রতিষ্ঠানের সকল যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার ইত্যাদি আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক, ভ্যাট ইত্যাদি মওকুফ।

গ) বিদেশে সফটওয়্যার প্রদর্শনী ও মেলাসমূহে অংশগ্রহণের জন্য সরকারী সহায়তা দান।

ঘ) বিদেশী সাহায্যে বাংলাদেশের সফটওয়্যার প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশী কোম্পানীকে অগ্রাধিকার দান।

দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার তরুণদের কর্মসংস্থান ও প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের লক্ষ্যে অন্যান্য অনেক অনুন্নত দেশের মতই অল্প বিনিয়োগে এবং অল্প প্রশিক্ষণে ডাটা এন্ট্রির কাজ জরুরী ভিত্তিতে শুরু করা সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে শুধু সারগর্ভ বক্তৃতায় কাজ হবেনা। সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে এগিয়ে যেতে হবে সমান তালে। সফটওয়্যার রপ্তানীর পদক্ষেপগুলো এ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের (বাকক) ভূমিকা ও গুরুত্ব অনেক। সরকারী প্রতিষ্ঠান বিধায় একে অনেক বাধ্য বাধকতার মধ্যে কাজ করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় উপযুক্ত পরিবেশে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কমপিউটার কাউন্সিল সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না — নানা প্রতিকূলতার আবর্তে। কমপিউটার কাউন্সিল সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের ভুল ধারনা আছে। সরকারী মাধ্যম হওয়াতে সাধারণের সাথে একটি ফাঁক থেকে যাচ্ছে বাককের। অথচ কমপিউটার কাউন্সিল অবশ্যই সার্বিকভাবে কমপিউটারের সাফল্য কামনা করে। এ ক্ষেত্রে নানা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মেলার মাধ্যমে ব্যবহারকারী ও কমপিউটার কাউন্সিলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। ব্যবহারকারীদের সমস্যাকে আপন সমস্যা মনে করে সহায়ক ভূমিকা নিতে হবে। যে কোন ডাকে দিতে হবে সঠিক সাড়া।

কমপিউটার কাউন্সিলের নিয়মিত চাকুরিরত বিশেষজ্ঞের অভাব দূর করতে হবে — যত দ্রুত পারা যায়।

এছাড়াও আমি মনে করি যে, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল যদি একটা বড় কমপিউটার সেন্টার পরিচালনা করতো যাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ হাতে কলমে করে তার সুফল বাকক বুঝিয়ে দিতে পারতো তাহলে প্রযুক্তির প্রসারতা বেড়ে যেতো বহুগুণে। এ রকম ২/৪টা উদাহরণ দেখে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও কমপিউটার ব্যবহারে আগ্রহী হত। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল অগ্রণী ভূমিকা নিলে অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে আসতো। তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণেরও একটা সুব্যবস্থা সম্ভব হত।

বাকক-এর ঘোষিত নীতিও কমপিউটার যথাযথ ব্যবহারের, প্রসারের নীতি। এই নীতি কার্যকর হলে এটা দেশের জন্য অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে।

দেশে কমপিউটার তৈরী বা সংযোজনের ব্যাপারে অনেক কথা হচ্ছে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি আমাদের দেশে বাজার অনেক ছোট। আভ্যন্তরীণ বাজারে আমাদের ব্যবসায়ীরা কমপিউটার তৈরী করে টিকতে পারবে না। কারণ বিদেশ থেকে যে যন্ত্রাংশ আমদানী করতে হবে সেটাতে শুল্ক হার বেশী পড়বে। অতএব সার্বিকভাবে যদি লাভ অর্জনে সক্ষম না হয় তাহলে ব্যবসায়ীদের ভরাডুবি হবে। এক্ষেত্রে বর্তমানে বিদেশ থেকেই আমদানী করে বাজারে চাহিদার পরিমাণ আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। যন্ত্রাংশ দেশে তৈরীর প্রকল্প বাস্তবায়িত করলেই কেবল আমরা দেশে কমপিউটার তৈরী করে বিদেশেও রপ্তানী করতে পারবো।

অনেক মন্ত্রনালয় ও সংস্থার কমপিউটারায়নে নির্লিপ্ততা এবং অজ্ঞতা দেশকে তথ্য বিপ্লবের সুফল থেকে বঞ্চিত করছে। এ বিপ্লবে যোগ দিতে আমাদের তো কোন প্রযুক্তিগত বাধা নেই, তবে কেন আমরা নিজেদের ও পরবর্তী বংশধরদের বঞ্চিত করবো এ সুফল থেকে? তাই আমার মতে, শিল্প বিপ্লবের পরে এই তথ্য বিপ্লবের মিছিলে আমাদের সকলকেই সামিল হতে হবে। এগিয়ে যাওয়ার পথে যে কোন নতুনত্ব ও বিপ্লবসহ সমস্ত কিছুকে আমরা স্বাগত জানাতে চাই অকুণ্ঠ চিত্তে, উদার মানসিকতায়।

বর্তমানে সরকার আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কমপিউটারের ক্ষেত্রে শুল্কহার ২০% থেকে কমিয়ে ৫% করেছেন। কিন্তু রাজস্ববোর্ডের ঘোষণায় কমপিউটারের সকল অংশ, কম্পোনেন্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে ২০% শুল্ক রয়ে গেছে। আমরা আশা করছি এটা ভুলবশতঃ হয়ে গেছে। আমরা এ ব্যাপারে সংশোধনীর জন্য রাজস্ব বোর্ডের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

কিন্তু, অপরদিকে কমপিউটারে ভ্যাট থাকার ফলে মোট আমদানী সময়ের শুল্ক ইত্যাদি এখনও পার্শ্ববর্তী সব দেশের তুলনায় বেশী। এছাড়া কমপিউটারের ক্ষেত্রে বিক্রয় কর ও আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য ছিল না। আমরা বর্তমানে ভ্যাট প্রত্যাহার করে সর্বমোট শুল্ক ৫% নির্ধারণ করার জন্য সদাশয় সরকার সমীপে আবেদন করেছি। আমরা আশা করবো আমাদের পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করার মানসে সরকার ভ্যাট প্রত্যাহার করবেন। এই ভ্যাট ও শুল্ক বৃদ্ধি কমপিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরূপপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই প্রযুক্তি দেশের প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক, শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমি একে বিশেষ রেয়াতের যোগ্য বলে মনে করি। তা না হলে দেশকে দ্রুত কমপিউটারায়ন করার সরকারী নীতিই শুধু ব্যর্থ হবে না – আধুনিক বিশ্বে আমরা পশ্চাদ পদচারনা শুরু করবো।

আমি আগেই বলেছি এদেশে কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলো ছোট এবং এদের উদ্যোক্তারা প্রধানতঃ নিজেরাই কমপিউটার বিশেষজ্ঞ বা প্রকৌশলী, এদের প্রায় সবারই আগ্রহ ও নিষ্ঠার অভাব নেই। কিন্তু এত ছোট বাজারে এতগুলো প্রতিষ্ঠান থাকায় প্রতিযোগিতা প্রচুর এবং টিকে থাকার লক্ষ্যে অনেকে নূন্যতম লাভে কমপিউটার ও সেবা বিক্রি করে থাকেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যথাযথ সেবা দেয়া সম্ভব হয় না।

তবে দেশে কমপিউটার ব্যবহার এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে এখন পর্যন্ত কমপিউটার বিক্রেতাদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী বলে আমি মনে করি।

আমার মনে আরো আশার আলো সঞ্চারিত হয় তখন যখন শুনি বা দেখি যে বাংলাদেশের মেধা দ্রুত বিদেশমুখী হয়েও উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে কাজে লাগছে। উন্নততর প্রশিক্ষণ নিয়ে আপামর জনগণের কাছে সেই শিক্ষা যত গণমুখী ও বাস্তবসম্মত হবে ততই দেশে দ্রুত কমপিউটার প্রযুক্তি প্রসারিত হবে। আমরা সকলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের সকল কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকবো। তবে আমরা একটা বিশেষ সুযোগ এখন তথ্য বিপ্লবের জন্য পেয়েছি, যা শিল্প বিপ্লবেরর সময় পাইনি। এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারলে সমস্ত জাতির জন্য এটা হতে পারে অগ্রগতির এক বিরাট পদক্ষেপ।

দেশে ব্যাপকভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি প্রসারে আমার মনে হয় কিছু সময় লাগবে। তবে আশার কথা যে, ধীরে ধীরে যত দিন যাচ্ছে ততই কমপিউটার প্রীতি ও প্রয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উন্নয়নক্ষেত্রে সর্বত্র আমি কমপিউটারের প্রয়োজনীয়তা দেখছি। শিক্ষা, ব্যবসা, প্রশাসন— সবখানে কমপিউটার আমাদের নানা দুরূহ সমস্যা সহজে কেমন করে সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে সহযোগিতা করছে। আমি আশা করছি আগামী ২/৩ বছরে বাংলাদেশের মেধা ব্যবহার করে বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে হঠাৎ জোয়ার সম্ভব। এই ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন সীমিতভাবে, তাদের সমৃদ্ধি হবে বল আশা করছি।

এখন "কমপিউটার জগৎ" পত্রিকাটির মাধ্যমে আমি আমার ব্যক্তিগত আকাংখাটি প্রকাশ করতে চাই। আমি মনে করি নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশে কমপিউটারায়নের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হবে। তাই আমি বর্তমান দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে একটি সফটওয়্যার রপ্তানী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে আগ্রহী। •

অনুলিখন ঃ রেহানা আখতার লাকী